

ঠাকুর উর্ধ্বদৃষ্টি, তাঁহার প্রেমরসাভিসিক্ত কণ্ঠে গাহিতেছেন ঃ
 গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
 কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায় ॥
 ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
 সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায় ॥
 দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু না মনে লয়।
 মদনের যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ॥
 কালীনামের এত গুণ, কেবা জানতে পারে তায়।
 দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ॥

ঠাকুর ভাবোন্মত্ত, যেন অগ্নিমস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গাহিতেছেন ঃ

[নামমাহাত্ম্য ও পাপ—তিন প্রকার আচার্য]

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।

আখেরে এ-দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী।

“কি! আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ! আমি তাঁর ছেলে। তাঁর ঐশ্বর্যের অধিকারী! এমন রোখ হওয়া চাই!

“তমোগুণকে মোড় ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরলাভ হয়। তাঁর কাছে জোর কর; তিনি তো পর নন, তিনি আপনার লোক। আবার দেখ, এই তমোগুণকে পরের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বৈদ্য তিনপ্রকার—উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে ‘ঔষধ খেও হে’ এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য—রোগী খেলে কিনা এ-খবর সে লয় না। যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, ‘ওহে ঔষধ না খেলে কেমন করে ভাল হবে! লক্ষ্মীটি খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি খাও’—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়—সে উত্তম বৈদ্য। এই বৈদ্যের তমোগুণ, এ-গুণে রোগীর মঙ্গল হয়, অপকার হয় না।

“বৈদ্যের মতো আচার্যও তিনপ্রকার। ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খবর লয় না—সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বরাবর বুঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে পারে, অনেক অনুনয়-বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোন আচার্য জোর পর্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য।”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

“যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।”

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্—২।৪]

ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?